Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 83 - 90
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মননের দর্পণে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : একটি নিবিড় মনঃসমীক্ষণবাদী পাঠ

অনুরাধা মুখার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID: anmukh2023@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Sarat Chandra Chattopadhyay, Sigmund Freud, Bengali novel, psychoanalysis, society, Bengali literature, literary theory, world war.

Abstract
Saratchandra Chattopadhyay is one of the best novelists of the 20th century. His works in Bengali literature have created an emotional essence that made him different from other contemporary novelists. The characters of his novels are created with so much compassion that an author can relate to them. As we know society impacts literature, also literary theories tell us the aim of the literature. In this paper, I would like to analyze how psychoanalyst Sigmund Freud's psychoanalytic perspective was reflected in Sarat Chandra's novels.

Discussion

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন অপরাজেয় কথাশিল্পী। মূলত বস্তুবাদ ও পুঁজিবাদের আপামর প্রভাবান্বিত সময়ে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি এক নবরূপের নির্মাণ ঘটালেন। তা হল চিরায়ত হৃদয়াবেগের সমন্বয়ে অঙ্কিত মানবচরিত্র-চিত্রণ। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভাবরসে সিক্ত, মানবিক, বাস্তব। কোনো অতিমানবিক বা অতিদৈবিকতা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করে না। বাস্তববোধে জারিত হয়ে সম্পৃক্ত হয় চরিত্রগুলির মনন, তা সে প্রধান চরিত্র হোক বা গৌণ চরিত্র। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সময় বাংলা সাহিত্যের আকাশে আবিভূর্ত হলেন, সেই লগ্নে ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় তাবড় নক্ষত্রেরা নিজেদের আলোয় আলোকিত। সেই স্থলে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র নিজের সৃজনীসত্তার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

‘সাহিত্য সমাজের দর্পণ’ এই কথাটি সর্বজনবিদিত ও প্রমাণিত। এই কথাটির সঙ্গে আরো একটি শব্দ মিলে যায় তা হল সাহিত্য সময়ের দর্পণও বটে। সময়ের স্রোত সাহিত্যে ভেসে ওঠে, সাহিত্য প্রাঙ্গণে এই সময়ের সঙ্গে মিশে থাকে সাহিত্য তত্ত্ব। তত্ত্ব আমাদের সাহিত্যের উৎসমুখ খুঁজতে সহায়তা করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন ১৯১৩ সালে এবং মনঃসমীক্ষণবাদী ধারণার প্রবক্তা সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণবাদী ধারণার জন্ম দেন ১৮৯৯ সালে, যদিও বিষয়টি জনপ্রিয়তা লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবার পর থেকে। বিজ্ঞান হোক বা সাহিত্য — মন চিরকালই বহুলচর্চিত বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রাচ্য-

পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিকেরা মন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা অজস্র তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন। যদিও তত্ত্ববিশ্বে ক্রমে কোনো কোনো তত্ত্ব বিশেষভাবে জনগ্রাহী হয়ে উঠেছে। মন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সর্বযুগে সর্বকালে নিরন্তর। তবে তাকে ব্যাখ্যামূলকভাবে প্রথম কাঁটাছেড়া করতে দেখা গিয়েছিল ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে। শিল্প-সৃষ্টি-সমাজ-সাহিত্যে মন যে সর্বতো ভাবে যুক্ত এবং তার যে ক্রমান্বিত বিকাশ তা প্রকাশ্যে এসেছিল ফ্রয়েডের দৌলতে। এখন এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রায়োগিক দিকটিকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলির আধারে আলোচনা করা হল।

একজন মানুষ তার সংজ্ঞান মনের সহায়তায় যে কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে, সেই স্থানে তার নির্জ্ঞান মনের প্রভাব সবসময় সক্রিয় থাকে, তাই বলা যায় যে, মানুষের বাহ্যিক যে ক্রিয়াকলাপ, তার সবকিছু কখনোই সত্য নয়। শরৎচন্দ্র সে বিষয়ে অবগত ছিলেন। যে কারণে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি; যেমন রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী, অভয়া, অচলা সবাই কোনো না কোনো ঘৃণ্য কাজের মধ্যে তাদের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করলেও শরৎচন্দ্র সেই চরিত্রগুলির এই প্রকার ক্রিয়াকলাপের নেপথ্যে তাদের অবচেতন মনের চিত্রও অঙ্কন করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে গবেষণার স্বার্থে বিশেষ কিছু উপন্যাস মনঃসমীক্ষণবাদী আলোচনার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করা হল।

'বড়দিদি' (১৯১৩) উপন্যাসটিতে প্রমীলার ছেলে মানুষ মাস্টারমশাই সুরেন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে বলা যেতে যায়, আত্মভোলা এবং মনস্তত্ত্বের ভাষায় অন্তর্মগ্ন (introvert)। এহেন মাস্টারমশাইয়ের যাবতীয় দায়িত্ব পিতার বাল্যবিধবা ও সংসারে নিবেদিত প্রাণ কন্যা মাধবী অর্থাৎ বড়দিদির ওপর বর্তায়। মনোবিজ্ঞানে বলা হয় সমুদ্রের তলদেশের রাজ্যের মতোই চেতনার পরে আছে দুর্জ্ঞেয় রাজ্য। সেখানে কী আছে তা মানুষের কাছে অজানা। ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে মাধবী। কিন্তু ধীরে ধীরে মাস্টারমশাইয়ের প্রতি তার ক্রোধ অভিব্যক্তির মাধ্যমে আদিম প্রবৃত্তিগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু সে বারবার সুরেন্দ্রর প্রতি নিজের বাসনার কথা প্রকাশ করতে চেয়েছে মনে মনে। চরিত্রটিতে ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্সের প্রভাবও দেখা গেছে।

'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) উপন্যাসে বিরাজ চরিত্রটির মনের জটিলতার আভাস মেলে। তবে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নেই, হয়তো সে যুগের রক্ষণশীলতার কারণে তা থেকে বিরত থেকেছেন ঔপন্যাসিক। তবে তার মধ্যে দিয়ে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তা হল পতিব্রতা হয়েও রাজেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ- যা অবচেতনার কামনা ব্যতীত কিছু নয়।

'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৫) উপন্যাসে কুসুমের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে গ্রামের সম্পন্ন চাষী বৃন্দাবন পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। এক্ষেত্রে তার আদিম প্রবৃত্তিকে সমাজসেবার মতো মহৎ কার্যে সে রূপান্তরিত করেছে। মনের প্রবৃত্তির এই ঊর্ধ্বগতিকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলে Sublimation।

'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) উপন্যাসে রমা চরিত্রটিকে ইদ-ইগো এবং সুপার ইগো* - এই দুটি বুনুনির মাধ্যমে গড়েছেন শরৎচন্দ্র। সামাজিক দিক থেকে রমেশের প্রতি তার আকর্ষণ অস্বীকৃত, অথচ নিজেও সেটা সে জানে, তাই শত্রুতার ছদ্মবেশে সুপার ইগো দিয়ে সে ইদকে দমন করতে চেয়েছে। কাশীযাত্রার শুরুতে সে যখন বলে,

> "আমি যখন আর থাকব না, তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশী দুঃখ যে আমিও পেয়েছি— তোমার মুখে এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।"[১]

'দেবদাস' (১৯১৭) উপন্যাসে আদতে দেবদাস-পার্বতীর প্রেমের আখ্যান রচনার পাশাপাশি তাদের মনের জটিলতার তলদেশের সূক্ষ্ম বিবরণ খুবই কম মেলে এই উপন্যাসে। দেবদাসের প্রথমে সক্রিয় ইগো থেকে পার্বতীর প্রেমকে অস্বীকার আবার পড়ে সেই দেবদাস আবার পার্বতীর কাছে ফিরতে চেয়েছে, তবে এখানে মনস্তত্ত্বের বিন্যাস খুবই সীমিত।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসটি বহু বিতর্কিত উপন্যাস। বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে ও বিপ্লবের সমর্থনে সব্যসাচী যেসব উক্তি করেছে তা প্রকৃত অর্থে শরৎচন্দ্রেরই যুক্তি। তিনি নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সময়ের অসহযোগ আন্দোলন বা আইন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 90
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অমান্য আন্দোলনকে সমর্থনের চোখে দেখেননি। বরং রক্তাক্ত বিপ্লবকেই যে স্বাধীনতা লাভের উৎকৃষ্ট পথ তিনি তা সমর্থন করেছেন।

প্রসঙ্গত, মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানবচরিত্রের মধ্যে বিপ্লব করার যে সুপ্ত বাসনা সে বিষয়ে একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। মানুষ সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ছেড়ে বিপ্লব করতে চায় - ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। দুনিয়ার সব মানুষ এরকম করে না, কিছু মানুষ করে। ফ্রয়েডের ভাষায়, এই বিপ্লববাদীরা আদতে স্বাভাবিক নয়। তাঁর মতে যে কোনো দেশেই বিপ্লব যারা করে সেই বিপ্লববাদের মূলে সক্রিয় থাকে একপ্রকার পিতৃদ্রোহিতা বা 'ঈডিপাস এষণা'; শৈশবে একজন শিশু তার মাতৃস্নেহ এককভাবে পেতে চায়, কিন্তু সেই পথে তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তার বাবা। যে কারণে আদিমকাল থেকেই শিশুমনের গভীরে তার পিতার প্রতি একপ্রকার ঘৃণা এবং তৎপরবর্তী বিদ্রোহ সুপ্তাবস্থায় থাকে। এটাই মানবজাতির আদিম প্রবৃত্তি। শৈশবকালীন অবদমিত বাসনা প্রকৃতঅর্থেই, "unconscious hostility towards father''.[২]

পিতার প্রতি মানুষের নির্জ্ঞান মনের বিদ্রোহ পরবর্তীকালে বিপ্লববাদের জন্ম দেয়। অন্যদিকে এই বিপ্লববাদের সমর্থকদের কার্যকলাপের নেপথ্যেও তাদের নির্জ্ঞান মনের এক প্রবৃত্তি কাজ করে। মানুষের মনের মধ্যে প্রেম, বেঁচে থাকার ইচ্ছে ইত্যাদি আদিম প্রবৃত্তির অন্তর্গত, একই সঙ্গে ধ্বংস করাও আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে। F. L. Lucas তাঁর 'The Decline and Fall of the Romantic Ideal' গ্রন্থে এই বিষয়ে লিখেছেন,

> "Among the most primitive of our impulses appears that lust for destruction which goes side by side with our passion to live."[৩]

বলা বাহুল্য বিপ্লবীদের মধ্যে এই আদিম প্রবৃত্তি অনেক বেশি মাত্রায় সক্রিয়।

উপন্যাসটিতে প্রেম-প্রবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বলা যায় এখানে প্রবৃত্তির 'Sublimity' ঘটেছে। বিপ্লববাদের 'Sublimation' থাকা সত্ত্বেও ইদের সম্পূর্ণ বিনষ্টিকরণ ঘটেনি, যার উদাহরণ সুমিত্রা চরিত্রটি। শশী চরিত্রটির রোমান্টিকতা অনেক সময়ে ফ্রয়েড প্রদত্ত 'Narcissism' এর কথা স্মরণ করায়। ভারতী চরিত্রটি শাশ্বত নারীর প্রতীককে বহন করছে।

'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) উপন্যাসটি বলা চলে শরৎচন্দ্রের অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উপন্যাস রচনাকালে ফ্রয়েড, কার্ল ইউং, অ্যাডলার হ্যাভলক প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা তাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন। মন সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি বর্ণনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। প্রেমের সম্পর্কে কমলের বক্তব্য,

> "একদিন যাকে ভালবেসেচি, কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।"[৪]

কিংবা প্রেমের স্মৃতিচারণ সম্পর্কে আশুবাবুকে সে বলে,

> "মনের বার্ধক্য আমি তাকেই বলি আশুবাবু, যে-মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না, যার অবসন্ন, জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়।"[৫]

তবে একথা বলতে হয়, উপন্যাসটিতে মানবমনের গোপন চিত্র খুব বেশি মাত্রায় ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেননি, যেটুকু আছে তা সীমিত।

তাঁর 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) উপন্যাসটি বহু বিতর্কিত। ফ্রয়েডের কথায় প্রেম-প্রবৃত্তি বা Sex-instinct এর মূলে যা প্রকৃত অর্থে সক্রিয় থাকে তা হল, ইদ। সাহিত্যিক বার্নার্ড শ তাঁর 'Man and Superman' নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে ডন জুয়ানের মুখে শোনা যায়,

> "In the Sex relation the Universal creative energy, of which the parties are both the helpless agent, overrides and sweeps away all personal considerations and dispenses with all personal relations."[৬]

অর্থাৎ, যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সৃজনশীল শক্তি দেখা যায়, তার উপস্থিতি সার্বজনীন। এই সময় উভয় পক্ষই অসহায় অবস্থায় থাকে, এবং ব্যক্তিগত বিবেচনাকে এড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে অধিক প্রাধান্য দেয়।

এখানেও একইভাবে সাবিত্রী প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে সতীশকে আকৃষ্ট করলে ক্রমান্বয়ে সতীশও এগিয়ে গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, Reality Principle, তাকে বিরত করেছে। সতীশকে তার বক্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য,

> "ভালোবাসি কি না! নইলে কিসের জোরে তোমার উপর আমার এত জোর? কিসের জন্য আমার এত বড় সুখ, আমার এত বড় দুঃখ? ওগো, তাই তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা দিতে পারলুম না।"[৭]

তবে এই উপন্যাসের সবচেয়ে মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র হল কিরণময়ী, ক্ষুধিত যৌবনের পিপাসার থেকে অহং এর সক্রিয়তা। প্রবৃত্তির জ্বালায় বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে চরিত্রটি, শেষ পর্যন্ত Perversion এ গিয়ে সমাপ্তি পেয়েছে চরিত্রটি।

চার পর্বে বিন্যস্ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি আপাদমস্তক মানব মনের গভীর তল সন্ধানের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। মানুষ নিজেও জানে যে তার মন তার নিজেই কাছে দুর্গম; রহস্যময়। হঠাৎ কোনো ঝাঁকুনি এলে মনের অতল দু-একটা রহস্যময় চেতনার ঝলক উদ্ভাসিত হয়, তখন নিজের মনের সেই গোপন গূঢ় সত্যকে হঠাৎ করে দেখতে পেয়ে মানুষ নিজেও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থের একস্থানে লিখেছে,

> "Man's craving for the grandiosity is now suffering the third and most bitter blow from present-day psychological research which is endeavouring to prove to the 'ego' of each of us that he is not even master in his own house, but that he must remain content with the veriest scrapes of information about what is going on unconsciously in his own mind."[৮]

আমরা জানি মানুষ নিজের মনের ঘরে কী চলছে, তা ভালো করে জানে না, শৈশবে মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছুই ঘটে যার কথা সে নিজে সজ্ঞানে ভুলে গেছে, কিন্তু তার নির্জ্ঞানে সেই ঘটনার স্থায়ী অস্তিত্ব রয়ে গেছে।

> "The little human being a frequently a finished product in the fourth or fifth year and only gradually reveals in later years what lies buried in him."[৯]

বিশেষ কিছু সময় বা মুহূর্তে সেই বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়ে থাকা ঘটনাগুলি পুনরুত্থিত হয়।

চার-পাঁচ বছর বয়সের ভালোলাগার অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে আজীবন দাগ কেটে যায়, প্রকৃত অর্থে তা লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু কখনো কখনো তা নিরাবরণও হয়ে পড়ে। বিষয়টির অন্যতম উদাহরণ হল রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি। মানুষের জীবনে সবসময় একই সঙ্গে দুটি বিপরীতমুখী কামনা বা ইচ্ছা চলতে থাকে। একদিকে সে যেমন প্রবৃত্তির জালে আটকে পড়ে, তেমনি অহং (ego) বা super-ego এর শাসনে সামাজিকতার মুখোশ পরে সামাজিক হয়ে থাকতে চায়। ফ্রয়েডের ভাষায় যাকে বলে উভয়াবেগ বা ambivalence। মানুষের মনে একই সঙ্গে আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে, এই দুয়ের সমাবেশকেই বলা চলে উভয়াবেগ। রাজলক্ষ্মী চরিত্রে যার প্রভাব দেখা গেছে।

দ্বিতীয় পর্বে ফ্রয়েড প্রদত্ত উর্ধ্বায়ণ বা Sublimation দেখা গেছে রাজলক্ষ্মী চরিত্রটিতে। ফ্রয়েডের কথায়,

> "Sublimation is a process of deflecting libido or sexual motive activity from human objects to new objects of a non-sexual, socially valuable nature."[১০]

এই উর্ধ্বায়ণের ফলে রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত নয় বরং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম চরিতার্থতা নয় বরং সামাজিকতায় মনোনিবেশ করেছে। এর পাশাপাশি অন্যত্র একটি বিষয়ে বলতেই হয়, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মনোবিশ্বের জটিলতাময় দ্বন্দ্ববিন্যাসকে চিত্রিত করার জন্যই যেন শরৎচন্দ্র কমললতার প্রেমের চিত্রটিকে বর্ণনা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটির বিষয়াবলী ও মনঃসমীক্ষণের কথা বলতে গিয়ে অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্যটি যথার্থ,

> "এখানে জটিল ও পরস্পরবিরোধী মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া গুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। মানসিক বৃত্তিগুলির দুর্জ্ঞেয় ও অভাবিত প্রকাশলীলার বিশ্লেষণেই শরৎচন্দ্রের লেখনীর যাদু ধরা পড়েছে।"[১১]

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে নরনারীর প্রবৃত্তির বিষয়গুলি প্রকাশিত। মানুষের অবচেতনের গভীরে যে ইদ সক্রিয় থাকে, তা pleasure principle দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেছেন,

> "We may only venture to say that pleasure is in some way connected with lessening, lowering or extinguishing the amount of stimulation present in the mental apparatus; and the pain involves the hightening of the latter."[১২]

অর্থাৎ বলা যায়, মানুষের মনের চাঞ্চল্যের হ্রাস ঘটে আনন্দের মাধ্যমে এবং চাঞ্চল্য বাড়লে তা দুঃখের ইঙ্গিত দেয়। মানুষের মনের চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ হল প্রবৃত্তি। সহজ করে বললে দুঃখ কমিয়ে সুখের বৃদ্ধি করাই প্রকৃত অর্থে মানবমনের প্রবৃত্তির লক্ষ্যবস্তু; যার উদাহরণ হল ষোড়শী চরিত্রটি।

অন্যদিকে জমিদার জীবানন্দ চরিত্রটি প্রথমদিকে নিষ্ঠুর–হৃদয়হীন থাকলেও শেষ পর্যন্ত ত্যাগে তার সমাপ্তি ঘটেছে, ফ্রয়েডীয় উভয়াবেগ দেখা গেছে এক্ষেত্রে। ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির লেখাতেও এই উভয়াবেগের ইঙ্গিত মেলে,

> "Human nature is in truth, a union of opposites that are not only incongruous but are contrary and conflicting; the spiritual and physical; the divine and the animal; conscious and sub-conscious; intellectual power and moral and physical weakness; unselfishness and self-centeredness; saintliness and sinfulness; … in short greatness and wretchedness … but the paradox does not end there. The conflicting elements in human nature are not only united there; they are inseparable from one another."[১৩]

এই প্রকার 'Contrary and Conflicting' অর্থাৎ বিপরীত এবং পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির ইঙ্গিত জীবানন্দ চরিত্রটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জীবানন্দ জীবনে প্রেম-ভালোবাসার অভাবে হৃদয়হীন হয়ে পড়েছিল যখন অলকা তার কাছে সেই প্রেম-ভালোবাসার অভাব মিটিয়ে দিয়েছে, তার চরিত্রের বদল ঘটিয়েছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসটিতে 'অচলা' চরিত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা দেখা যায়। দুই পরস্পরবিরোধী চরিত্র মহিম ও সুরেশের টানাপোড়েনের ফলে তার চরিত্র যে খাদের অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গত, সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানকার গ্রন্থাগার থেকে জানা যায়, তিনি প্রমুখ বিদেশি ঔপন্যাসিকদের রচনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। রুশ ঔপন্যাসিক ফিওডোর ডস্টয়েভস্কি (১৮২১-৮১), ও লিও টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) নামও শোনা যায়। এক্ষেত্রে অচলা চরিত্রটির সঙ্গে ডস্টয়েভস্কির 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' উপন্যাসের নায়িকা নাতাশার সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে। তার দুই প্রণয়ী-- ভানিয়া হল শান্ত এবং আলিওশা হল আবেগ উন্মত্ত। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই দুই প্রণয়ীকে ঘিরে নাতাশার মনে এক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন চলেছে, কখনও সে ভানিয়াকে চেয়েছে, কখনও বা আলিওশাকে। তবে অচলা এক্ষেত্রে মহিমকে সেই পরিমাণ প্রেমে বঞ্চিত করেনি, যতটা নাতাশা ভানিয়াকে করেছিল। তবে 'নাতাশা-অচলা' চরিত্রের সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে মেলে। 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' উপন্যাসে কথক ভানিয়ার কথায়,

> "…নাতাশার মধ্যে ভারী একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার সঙ্গে তার সেই আগের খোলামেলা সম্পর্কের চিহ্ন মাত্র আর ছিল না, শুধু তাই নয়, আমার সম্পর্কে ও যেন অবিশ্বাসীই হয়ে উঠেছিল। ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে গেলে তাতে শুধু ওর ব্যথাই বাড়ত। …মাঝে মাঝে ওর ঘরে বসে ওকে লক্ষ্য করে দেখতাম; …কিছুরই যেন খেয়াল নেই, এমনকি আমি যে এখানে, ওর কাছেই আছি তাও যেন ভুলে গেছে।"[১৪]

ডস্টয়েভস্কির চরিত্রগুলি আবেগ বা ভাবভঙ্গি প্রকাশে অনেক বেশি ব্যক্তিক, যেখানে শরৎচন্দ্র তাঁর 'গৃহদাহ' উপন্যাসে ভালোবাসাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলেছেন,

> "বাগানের গেট পার হইয়া গাড়ি যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, তখন সুরেশ আস্তে আস্তে ডাকিল, অচলা!
> কেন?
> আজকাল আমি কি ভাবি জানো?
> না।
> এতকাল যা ভেবে এসেছি ঠিক তার উলটো। তখন ভাবতুম, কি করে তোমাকে পাবো; এখন অহর্নিশি চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারিনে।
> এই অচিন্ত্যপূর্ব একান্ত নিষ্ঠুর আঘাতের গুরুত্বে ক্ষণকালের জন্য অচলার সমস্ত দেহ-মন একেবারে অসাড় হইয়া গেল। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, তথাপি অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, আমি জানতুম। কিন্তু এ ত -

> সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই ভুল। তোমরা থাকে বল পাপের ফল। কিন্তু তবুও কথাটা সত্য। মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ স্বপ্নেও ভাবিনি।”[১৫]

অন্যদিকে লিও টলস্টয়ের উপন্যাস ‘অ্যানা কারেনিনা’ উপন্যাসের নায়িকা অ্যানার জীবনসমস্যার সঙ্গে অচলার জীবনসমস্যার সাদৃশ্য মেলে; অ্যানা বিবাহিত, কিন্তু তাও সে তার প্রেমিক ভ্রনস্কীর প্রতি আবেগবহুল। এমনকি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার জন্য সে অবাঞ্ছিত সন্তানের জননীও হয়েছে। তাই শেষপর্যন্ত মনের ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যাকেই সে বেছে নিয়েছে। অ্যানার মনের গভীর দ্বন্দ্বের আভাস বোঝাতে স্বপ্নের সাহায্য নিয়েছেন ঔপন্যাসিক,

> “She sees the hideous nakedness of her position, she dreams of two husbands, two alekeys two happiness and the dream weighed like a nightmare because it dramatized the impossibility of the only situation.”[১৬]

অ্যানার পরিণতি এবং অচলার পরিণতি এক নয়, এক্ষেত্রে সাদৃশ্য হল অচলা কিংবা অ্যানা দুজনের জীবনেই দুজন পুরুষের আগমন এবং সেই টানাপোড়েনে জীবন ট্রাজেডিতে পর্যবসিত হয়েছে। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এঁদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও ‘অচলা’ চরিত্রটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি।

সমগ্র উপন্যাসে অচলার মানসিক জটিলতা বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাক— স্বামী মহিমকে অচলা গভীরভাবে ভালোবাসত, যে ভালোবাসায় সুরেশ বারবার বাধা দিলেও বিবাহের ক্ষেত্রে মহিমকেই সে গ্রহণ করেছে। মহিমের প্রতি তার আত্মসমর্পণ,

> “ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল— অচলা সুমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আরক্ত চক্ষুর পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে। কাছে আসিতেই বলিল, তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্য রেখে গেলে? ...মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট-দুই পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান হাতটি। বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙুল হইতে সোনার আংটিটি খুলিয়া তাহার আঙুলে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি করো।”[১৭]

একজন নারী এতটা গভীরভাবে একজন পুরুষকে ভালোবেসেছে, অথচ সেই ভালোবাসার গভীরতা নিয়ে মনঃসমীক্ষণবাদের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ওঠে, যখন সুরেশের প্রতিও তার দৌর্বল্যতা প্রকাশিত হয়। সুরেশের মৃত্যুর পর মহিমের প্রতি অচলার নির্ভরশীলতার দিকটিও দেখা যায়। অথচ লক্ষ্যণীয়, বিয়ের দিন স্থির হওয়ার পরেও সুরেশ সম্পর্কে অচলার মনে এক প্রকার মোহসুলভ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। বিবাহের পরে স্বামী মহিমের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও সুরেশের প্রতি আকর্ষণ,

> “অচলা কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে বলো, এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না - আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও— যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্য আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।”[১৮]

অচলার মনের Id, Ego এবং Super-ego - তিনটির প্রশ্রয় প্রবল ভাবে ছিল। সামাজিক সতীত্ব (Ego এবং Super-ego) ও প্রবৃত্তিজাত কামনা (Id) - সুরেশকে সে ভালোবাসলেও সে যে তার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে রাত কাটাবে, এ কথা সে একবারের জন্যও ভাবেনি। মহিম চরিত্রটি অন্তর্মগ্নতায় ভরা, যা ক্রমে তাকে হীনমন্যতার (Inferiority Complex) দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে সুরেশ চরিত্রটির সঙ্গে কখনো ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের মহেন্দ্র আবার কখনো ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের ‘সন্দীপ’ এর সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে, তবে চরিত্রটি নিজ বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র।

প্রসঙ্গত, এই উপন্যাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল বিষয় হল, সুরেশের কাছে অচলার দেহদানের ঘটনার সঙ্গে প্রকৃতির দুর্যোগলীলার অপূর্ব বর্ণনা। দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে অচলা যখন সুরেশের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্তের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনাও একাকার হয়ে যায়,

> “আজ জীবনের এই চরম মুহূর্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না— নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারা রাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।”[১৯]

যৌন ব্যাভিচারের এই প্রকার উন্মাদনাময় সাঙ্কেতিক চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায় বিরল বললেই চলে, যেখানে যৌন প্রবৃত্তি আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

পরিশেষে, বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী সময়ে যিনি উপন্যাসের ধারাটি সার্থকভাবে বহন করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথের দিশা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দেখিয়ে ছিলেন এবং সেই পথে আংশিক ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেই পথকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বজদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছেন। উপন্যাসে নারী-পুরুষ চরিত্র গুলির মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে খানিক দ্বিধান্বিত হয়েছেন। মানবজীবনের বাস্তবভিত্তিক অনুসৃজন এবং তার পরিমিত প্রতিস্থাপন -এই ছিল তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক ‘ভারতী’ পত্রিকা গোষ্ঠী ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ সম্পর্কে অবগত ছিল, যার সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেই যুক্ত ছিলেন। এই গোষ্ঠীর ফ্রয়েড-চর্চার প্রভাব তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। তাই হয়তো কাহিনির সুসংঘবদ্ধতাকে উপেক্ষা না করেও তিনি নরনারীর চরিত্রবিকাশের দিকে নজর দিয়েছেন বেশি। বাহ্যিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নরনারীর মনের হালহদিশের দিকটি উন্মোচিত হলেও চরিত্রগুলির মগ্ন-চৈতন্যের বর্ণনা-বিশ্লেষণে তিনি সীমাবদ্ধ। তিনি চরিত্রগুলির আবেগতাড়িত মননশীলতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন যার ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি শেষলগ্নে পৌঁছে অনেক বেশি sentimental এবং emotion হয়ে উঠেছে।

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনের তিনটি স্তর দেখিয়েছেন,

ইদ (Id)- Pleasure Principle, যা মূলতঃ আনন্দলাভের জন্যেই সৃষ্ট,

সুপার ইগো (Super Ego) বা অধিশাস্তা অথবা Morality Principle, যা বিবেক বা নৈতিক বোধ, সমাজের ঠিক বা ভুলের ওপর নির্ভর করে মানুষকে চলতে শেখায়,

ইগো (Ego) - Reality Principle - ইদ ও সুপার ইগোর মধ্যে মধ্যস্থতায় সহায়তা করে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, *শরৎ রচনাবলী (১ম খন্ড),* জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৪৪৩

২. Brill, A. A. (ed.), The Basic writings of Sigmund Freud, p. 123

৩. Lucas, F. L. The Decline and Fall of the Romantic Ideal, Cambridge University Press, UK, 1954, P. 114

৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, *শরৎ রচনাবলী (১ম খন্ড),* জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৪২১

৫. তদেব, পৃ. ৪২৪

৬. Shaw, George Barnard, *Man and Superman,* Westminster: Archibald constable & co. ltd. 1903, p. 125

৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা (১ম খন্ড) শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২১১

৮. Freud, Sigmund, *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*, p. 241

৯. Ibid, pg. 298

১০. Brill, A. A. *The Basic Writings of Sigmund Freud,* 1938, p. 19

১১. দাস, সুকুমার, সম্পাদিত ‘শ্রীকান্ত’ প্রবন্ধ, *‘শরৎ তর্পণ’,* (অক্টোবর ১৯৭৬) পৃ. ১৯৮, ৪০ নং পাদটীকা

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার, *বাংলা উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিকতা (১৯০০-১৯৩৫),* জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ. ১৬২

১৩. Toynbee, Arnold, *An Historical Approach to Religion,* (1957), p. 287

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 90
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. ডস্টয়েভস্কি, ফিওডোর, *বঞ্চিত লাঞ্ছিত*, অনু. ননী ভৌমিক, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, প্রথম বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৩৪২

১৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, *গৃহদাহ*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃ. ২১৬

১৬. Matlow, E. Ralph (ed.), *Tolstoy*, গ্রন্থে R. P. Blackmur- 'The Dialectic of Incarnation: Tolstoy's Anna Karenina', p. 134

১৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, *গৃহদাহ*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃ. ৬৪-৬৫

১৮. তদেব, পৃ. ১০৯-১১০

১৯. তদেব, পৃ. ২১৪